Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 436–442
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাংলা গানের বিবর্তনের ধারা : প্রেক্ষিত বাংলা চলচ্চিত্র

স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
ই-মেল : snigdhachakravarty1995@gmail.com

Keyword
গীতিপ্রবণ, সঙ্গীতনির্ভর, চলচ্চিত্র, জনপ্রিয়তা, সাহিত্য, জীবনদর্শন, পরিচালনা, গতানুগতিকতা।

Abstract
সময়ের বিবর্তনক্রম অনুযায়ী সমাজে চেতনা ও সংস্কৃতিজনিত যে পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তন শিল্পের প্রতিটি আঙ্গিককেই সতত প্রভাবিত করে চলে অবিরত। শিল্পের দুইটি বিশেষ প্রকাশমাধ্যম হল- চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীত। বাঙালি সমাজে তথা সংস্কৃতিতে সঙ্গীত তার যাত্রালগ্ন থেকে শুরু করেই যেমন বরাবরই সাহিত্যিক গুণকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে, ঠিক তেমনি চলচ্চিত্রও একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত সাহিত্যেরই অন্যতর এক ভিন্ন প্রকাশমাধ্যম হিসেবে বিকশিত হতে হতে তার পথ চলেছিল। বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র-পরিচালকরা ক্রমশ সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র- শিল্পের এই দুই প্রকাশমাধ্যমকে স্বতন্ত্রভাবে অবলোকনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকে এক ভিন্নতর শিল্প-আঙ্গিকে দেখতে চান। সেই সূত্রেই বাংলা চলচ্চিত্রের গতিপথও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আর, সেই বিবর্তনের পথে ক্রমশ চলচ্চিত্রের অন্যতম একটি অঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়েছে সঙ্গীত। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে গান ব্যতীত চলচ্চিত্রের অস্তিত্বকে কল্পনাই করা যায় না। চলচ্চিত্র বিকাশের পথে সঙ্গীতের অবদান প্রধানত দুই রকমের- এক হল চলচ্চিত্রের আবহসংগীত, আর হল ভাষিক রূপে সঙ্গীতের ব্যবহার। চলচ্চিত্রের ভাবের সাথে যথাযথ সাযুজ্য রেখেই গানকে চলচ্চিত্র-ভাষারই এক স্বতন্ত্র প্রকাশ রূপে বিবেচিত করা হয়। একদিকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র, আরেকদিকে বক্তব্যধর্মী অন্যধারার ছবি—এই দুই ভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্রই তাদের অভীষ্ট প্রকাশমাধ্যমকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন তৈরি করে ভিন্নরুচির দর্শক, ঠিক তেমনি সেই দুই ধারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরে প্রযুক্ত সঙ্গীতের মাধ্যমেও উদ্দিষ্ট শ্রোতাকুলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় অনন্যপরতা। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সঙ্গীতের বিকাশের পাশাপাশি তৈরি হয় এমন এক সিনেমাকেন্দ্রিক গানের ধারা, যার মাধ্যমে গান ক্রমশ হয়ে ওঠে বিপণনযোগ্য পণ্য। গানের এই পণ্যায়িত বিশেষ রূপ জনপ্রিয়তার নিরিখে কখনো চলচ্চিত্রকে কেন্দ্রে রেখে, কখনো-বা স্বতন্ত্রভাবে এমনভাবে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়, যার মধ্যে শিল্পমূল্যের বিচারবোধ কোথাও মুখ্য, আবার কোথাও বা গৌণ রূপে স্তিমিত অবস্থায় থাকে। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিশ্বমানের চিত্রপরিচালকেরা সঙ্গীত তথা সুরযোজনার ক্ষেত্রে সঙ্গীত-পরিচালকদের দিয়ে সুর সংযোজনে অধিক সংখ্যক সময়েই সিনেমার বক্তব্যের নিরিখে সঙ্গীত পরিচালনা করতে চান। সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে ঋত্বিক ঘটক, ঋতুপর্ণ ঘোষ, এমনকি হাল আমলের চিত্রপরিচালকেরাও পর্যন্ত চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে সঙ্গীতের ভিন্নধারার জন্ম দিয়েছেন তাদের চলচ্চিত্রে। পাশ্চাত্যের নানা সুরের প্রয়োগ, ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও মার্গ সঙ্গীতের ধারা, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিন্নতর ও আধুনিক প্রয়োগশৈলীর ব্যবহার, পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রানুসঙ্গ বর্তমানে চলচ্চিত্র-

কেন্দ্রিক সঙ্গীতের ধারাকে এক অত্যুচ্চ চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক এই গানের ধারার ক্রমান্বয়ী বিবর্তনের নানা অভিমুখকে গবেষণার আলোকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত করাই এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায়।

Discussion

এক

"এ দেশটার মতো এমন গানপাগলা দেশ আর কোথাও নেই।"[১]

সত্যি সত্যি এত ভঙ্গ, তবু রঙ্গে ভরা বঙ্গদেশে গানের কোনো শেষ নেই। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে একেবারে আজকের আধুনিক নব্য যুগ পর্যন্ত আমাদের সমাজ তথা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে এই গানের ভুবন। ভারতবর্ষের গীতিপ্রবণ ভূমিতে ধর্মীয় সাধনা, বিশেষত ভক্তিবাদী সাধনার সঙ্গে সঙ্গীতের সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও সংস্কৃতির অন্যতম প্রকাশমাধ্যম আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রেও গানের আগলবিহীন যাতায়াত। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা কার্যত দিনালোকের মতো সত্য যে, বাংলা সাহিত্য তার সূচনাবিন্দু থেকেই মূলত সঙ্গীতনির্ভর হিসেবেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে চর্যাগান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল গানের ঐতিহ্য পেরিয়ে বাংলা গান রবীন্দ্রনাথের কলমে ক্রমশ যৌবনপ্রাপ্তির অভিমুখে অগ্রসরমান হয়েছে। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুলের হাত ধরে বাংলা গানে বিষয়কেন্দ্রিক সম্পূর্ণ নতুন অভিমুখের যোগসূত্রে ক্রমশ পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে আধুনিক বাংলা গান। তারপর গণনাট্য সংঘের বিকাশের সূত্র ধরে ক্রমশ বিশ শতকের বাংলা গান সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুধীন দাশগুপ্তদের হাত ধরে 'গণসংগীত' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তীতে সত্তর-আশির দশকের গানের অন্ধকার যুগ পেরিয়ে বাংলা গানের ভুবনে 'নতুন গানের ভোর' নিয়ে এসেছেন সুমন-অঞ্জন-নচিকেতা। সঙ্গীতের ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই বিকাশের পাশাপাশি চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করেও বাংলা গান বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে বিকশিত হয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার। সংস্কৃতির বিকাশের পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃশ্য এবং শ্রব্য মাধ্যম হল- চলচ্চিত্র। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের চলচ্চিত্রেই সঙ্গীত বর্তমানে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি শাখা হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের বাংলা ভাষাভাষী চলচ্চিত্রের সাথেও গানের যোগ অতি সুগভীর ও সুবিস্তৃত। বাংলা চলচ্চিত্রের সাথে গানের যোগ এবং পরবর্তীতে বাংলা চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে সময়ের নিরিখে গানের কী ধরনের বদল আসছে, সে বদলকে চিহ্নিত করতে গেলেও সবার আগে প্রয়োজন বাংলা ভাষাভাষী চলচ্চিত্রের একেবারে শুরুর শুরু যে পথ দিয়ে, সেই পথে হেঁটে আসা। তাতে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের সাথে সঙ্গীতের যোগসাজশের চড়াই-উৎরাই পথটিকে খোঁজা তুলনামূলক সহজতর হবে।

বাংলা চলচ্চিত্রের যাত্রাপথের একেবারে শুরুর কাল সেই মোটামুটি **১৯১৯** সাল থেকে নির্বাক চলচ্চিত্র দিয়ে। 'বিল্বমঙ্গল' বাংলার প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র। নির্বাক চলচ্চিত্রের সময়েও পটভূমিতে আবহসঙ্গীতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলই। তবে **১৯৩১** সালে মোটামুটিভাবে 'জোর বরাত' চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে বাংলা সবাক চলচ্চিত্রের যুগের প্রারম্ভের সূত্রপাত। এই সময় থেকেই ক্রমশ বাংলা গানের চলচ্চিত্র-শরীরের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠার শুভ সূচনা। অবশ্য বাংলা সবাক চলচ্চিত্রের আত্মপ্রকাশের আগেও বেতার সম্প্রচার বা অন্য নানা মাধ্যমে বিপণনযোগ্য বাংলা গানের বিকাশের পথ ক্রমশ সুগম হয়ে উঠছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে থিয়েটারের জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম হাতিয়ার যেমন ছিল সঙ্গীত, ঠিক তেমনি বাংলা চলচ্চিত্রের অতি তীব্র জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রেও অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উনিশ শতকে বাংলা নাটককে কেন্দ্র করে নাট্যনির্ভর গানের ধারাকে জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বয়ং। গ্রামোফোন বা রেডিওর চলনপথের সমান্তরাল ধরেই বাংলা গান ক্রমশ সম্প্রচার ও জনপ্রিয়তার নিরিখে বিপণনযোগ্য বাংলা গানের প্রসারের ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করতে করতে ক্রমশ এগিয়ে চলেছিল। পরবর্তীকালে থিয়েটার বা চলচ্চিত্রের আলোকোজ্জ্বল যাত্রাপথের সূত্র ধরে সেই চলা আরো গভীরতর রূপ লাভ করে।

দুই

চলচ্চিত্রের ইতিহাস ঘাঁটলেই এ কথা প্রতীত হবে যে, আজ বাংলা চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তার নিরিখে যে শিখরে পৌঁছে গেছে, শুরুর সময়ে তার অবস্থা এতটা উন্নত ছিল না মোটেই। বিশ শতকের একটা বিশেষ সময় পর্যন্তও আত্মপ্রকাশ তথা শ্রেষ্ঠত্ব তথা জনপ্রিয়তার নিরিখে সাহিত্য এতটাই ব্যাপক-বিস্তৃত একটা গ্রহণীয় মাধ্যম ছিল যে, চলচ্চিত্রকে একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হয়ে ওঠার জন্য সাহিত্যের সাথে পাল্লা দিয়ে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে। শিল্প সংক্রান্ত নানা মাধ্যমগুলির মধ্যে বিশ শতকের শুরুর কাল থেকেই তুলনামূলক আলোচনা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সারস্বত আবহাওয়ায়। একটা সময়ে তো সাহিত্যেরই আত্মপ্রকাশের এক ভিন্নতর আঙ্গিক হয়ে উঠছিল বাংলা সিনেমা। কিন্তু সময় বদলেছে। সময়ের সাথে সাথে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্তের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্বরা এসেছেন বাংলা সিনেমার অঙ্গনে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে তারা জনমানসে এই ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যে চলচ্চিত্র সাহিত্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো মাধ্যম নয়। শিল্পের যে সত্য শাশ্বত রূপ, তা সাহিত্য-শিল্পের মতো চলচ্চিত্র-শিল্পেও প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। এই ধারণা একটু একটু করে বিস্তৃতি ছড়াতে শুরু করার ফলে চলচ্চিত্রও আস্তে আস্তে গ্রহণযোগ্য একটি মাধ্যমে পরিণত হতে শুরু করে। ক্রমশ চলচ্চিত্রের একটি অনস্বীকার্য স্বীকৃত অঙ্গ হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের গান। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই চলচ্চিত্রের গানকে ফরমায়েশি 'বায়োস্কোপের গান' বলে দূরে সরিয়ে রাখা হত। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক থেকে গানকে চলচ্চিত্রে এমনভাবে প্রয়োগ করা হল, যাতে গানের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের অন্তর্গত ভাবেরই প্রকাশ ঘটে। বিশ্বখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালকেরা সুরকার-গীতিকারদের দিয়ে একেবারে সুপ্রযুক্ত কথা ও সুরের এমনই সম্মিলন ঘটাতেন, যার মাধ্যমে সমকালীন সমাজে সঙ্গীত চলচ্চিত্রের ভাষায় একটি অন্য মাত্রা যুক্ত করল ক্রমশ।

চলচ্চিত্রের গানের পর্ব-বিভাগ করতে গেলে একদিকে যেমন থাকবে চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক গান, তেমনি আরেকদিকে থাকবে তার আবহ-সঙ্গীত। এই দুই ক্ষেত্রেই বাংলা চলচ্চিত্রে একেবারে যেন ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতায় উদাহরণের সৃষ্টি করেছেন সত্যজিৎ রায়। বাংলা চলচ্চিত্রে সুরের ক্ষেত্রে পরিচালক হিসেবে তিনি অপূর্ব সুর-সংযোজন পরিকল্পনা তথা সঙ্গীত পরিকল্পনার মাধ্যমে অনন্যসাধারণ উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানতেন যে, চলচ্চিত্র আসলে শেষপর্যন্ত যে বৃহৎ জীবনদর্শনের সাথে যুক্ত হতে চায়, সেই জীবনদর্শনের সাথে মিলিয়ে সঠিক সুরযোজনা করতে পারলে সেই চলচ্চিত্র বিশ্বমানের রূপ নেয়। চলচ্চিত্রের আবহসংগীত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন,

> "আজকের দিনের সুরকার জানেন যে ছবির মেজাজই আবহসংগীতের রূপ নির্ধারিত করে। কোন পুঁথিগত নিয়ম বা শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ এখানে খাটে না।
>
> এখানে পরিচালকের দায়িত্ব অনেকখানি। ছবির মূল সুরটি পরিচালকের চেয়ে ভালো করে আর কে জানবে ? বিশেষত ছবি যদি নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন আঙ্গিকে রচিত হয় ; তাহলে সে ছবিতে আবহসংগীতের প্রয়োজন আছে কি না, বা, থাকলে তার প্রকৃতি কেমন হবে, তা পরিচালকেরই স্থির করা উচিত।"[২]

১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পরিচালক সত্যজিৎ রায় পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দিয়ে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগের উপর নির্ভর করে সেতারের সুরযোজনার মাধ্যমে এমন আবহসংগীত নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা আজও সংগীতের ইতিহাসে অমলিন হয়ে আছে। প্রাবন্ধিক জে. হোবারম্যান 'পথের পাঁচালী'-র আবহের সুরযোজনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন-

> "In a burst of virtuosity, Ravi Shankar composed and recorded the trilling score—at once plaintive and exhilarating—in an all-night session."[৩]

সুর সাধারণত প্রকৃতিসৃষ্ট। মেঘমল্লার, হংসধ্বনি ইত্যাদি রাগের নাম থেকেই তা সহজে প্রতীত হয়। এই প্রকৃতিসৃষ্ট সুরই যখন জীবনের আনন্দঘন ও বেদনাদীর্ণ পর্যায়ক্রমিক যাত্রাকে একই সুরে গেঁথে জীবন-অতিক্রমী এক বোধকে পরিব্যাপ্ত করে, তখন তা উত্তীর্ণ হয় শিল্পের পর্যায়ে। 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত পণ্ডিত রবিশঙ্কর কৃত এই সুরও যেন একইসাথে হয়ে ওঠে জীবনের বেদনাবিবশ অভিজ্ঞান ও আনন্দরূপঅমৃতের এক অপূর্ব ভাব-সম্মিলন। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি পরিচালক সত্যজিতের আবহসংগীত নির্মাণ ও সংগীতদক্ষতার পরিচয় পেলে বিস্ময় জাগে বৈকি! 'তিনকন্যা', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা',

'চারুলতা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ইত্যাদি চলচ্চিত্র নির্মাণেও সত্যজিতের সচেতনকৃত আবহসংগীত নির্মাণ তাঁর এক আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তবে শুধু আবহসংগীত নির্মাণেই নয়, 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন', 'গুপী বাঘা ফিরে এল', 'হীরক রাজার দেশে' ইত্যাদি তথাকথিত শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নির্মিত চলচ্চিত্রেও তার সঙ্গীতযোজনা দর্শককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পরিচালক সত্যজিতের শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি সেখানে গীতিকার বা সুরকার সত্যজিতের ভূমিকাও অনির্বচনীয়। 'ও মন্ত্রীমশাই, ষড়যন্ত্রী মশাই', 'ও হাল্লা রাজার সেনা', 'আমি কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়', 'নহি যন্ত্র নহি যন্ত্র, আমি প্রাণী' ইত্যাদি নানা গানে ভারতবর্ষের চিরকালীন 'Class' ও 'Mass'-এর বিপ্রতীপ বিরোধপূর্ণ অবস্থান সহজেই ধরা পড়ে। ভারতীয় চলচ্চিত্র তথা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস এবং চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক সঙ্গীত পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে সত্যজিৎ যে উচ্চতায় আরোহণ করেছিলেন, সেই ধারা আজও সমৃদ্ধ করে চলেছে বাংলা গান ও সাহিত্য তথা বাংলা চলচ্চিত্রের গতিপথকে। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যেও সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'গণশত্রু', 'শাখাপ্রশাখা', 'আগন্তুক' ইত্যাদি 'ল্যান্ডমার্ক' সিনেমাগুলিতে সিনেমার নিজস্ব স্বর অনুযায়ী অপূর্ব দক্ষতায় লোকসুর, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর, আবার কখনো রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুপ্রযুক্ত প্রয়োগ ঘটতে দেখা গেছে। দেশি, বিদেশি নানা সুরের মিলনে সত্যজিতের নির্মিত চলচ্চিত্রের গান সেকালের যে কোনো শ্রেষ্ঠতম গীতিকারের সাথে তুলনীয় হতে পারে।

বাংলা গানের স্বর্ণযুগের সমসময় আসলে বাংলা সিনেমারও স্বর্ণযুগ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোরকুমার প্রমুখ সঙ্গীতশিল্পীরা বাংলা চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক গানের সেই স্বর্ণযুগের সাক্ষ্যকে বহন করেছেন তাদের কণ্ঠে। 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী', 'বসন্তবাহার', 'মৌচাক', 'এন্টনি ফিরিঙ্গি', 'ধন্যি মেয়ে' ইত্যাদি নানা সঙ্গীতনির্ভর বাংলা চলচ্চিত্র একসময় যেমন এসেছে এবং সেসকল চলচ্চিত্রের সঙ্গীত অমরত্বের পথে আজও চলমান হয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি একটা সময়ের পর আশির দশক থেকে বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রেও যেমন ভাঁটার সময়, ঠিক তেমন বাংলা গানের ক্ষেত্রেও সেই অন্ধকারকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। অথচ এ কথা অস্বীকার করার কার্যত কোনো উপায় নেই যে, বাংলা রোমান্টিক চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে একসময় এমন বহু রোমান্টিক গান তৈরি হয়েছে বাংলায়, যা আজও সংগীতের ইতিহাসে কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু আশির দশক, এমনকি নব্বইয়ের দশকের শুরু এবং পরবর্তীতেও বাংলায় মূল ধারার বাণিজ্যিক যেসব ছবি তৈরি হয়েছে, তা এতটাই গতানুগতিক অনুবর্তন এবং গতিহীন হয়ে পড়েছিল যে, বাঙালি শ্রোতা বাংলা চলচ্চিত্র এবং বাংলা গানের দিক থেকে ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নেয়। এছাড়া তো সেই সময় ছিলই বলিউডি এক তীব্র আগ্রাসনের 'মাৎস্যন্যায়', যা বাংলা ভাষাভাষী চলচ্চিত্র তথা বাংলা গানকে একেবারে গিলে ফেলেছিল ক্রমশ। বাংলা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানে এমন কিছু আকর্ষণ বা নূতনত্ব তৎকালে প্রায় ছিলই না, যা উদ্দিষ্ট শ্রোতাকে (Target Audience) আকর্ষণ করতে পারে। রোমান্টিকতার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ তথা প্রেমজ ভাষায় আবদ্ধ হওয়ার গতানুগতিকতা বাঙালি শ্রোতাকে ক্রমশ এসময়কালের নিরিখে বাংলা গানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করে। এখানে একটা কথা আলাদা করে উল্লেখ না করলে ভুল হবে যে, বাংলা সিনেমায় এই সময় থেকেই ক্রমশ দুই রকমের বিভাজন স্পষ্ট রূপ নেয়- একদিকে মূল ধারার গতানুগতিক 'রোমান্স'নির্ভর বা 'অ্যাকশন'নির্ভর বাণিজ্যিক ছবি, আর আরেকদিকে এই বিশ শতকের নয়ের দশক থেকেই ক্রমশ তৈরি হচ্ছে এই বাণিজ্যিক ছবির সমান্তরালে 'আর্ট ফিল্মে'র বক্তব্যধর্মী চলচ্চিত্রের এক নতুন ধারা। এই দুই ধারা খুব স্পষ্টভাবেই পরিচালক-প্রযোজক-সুরকারদের মধ্যেও বিভাজন স্পষ্ট করেছে। ফলে নব্বইয়ের দশকের বাংলা সিনেমা জুড়ে একদিকে গান গাইছেন কিশোর কুমার, আশা ভোসলে, লতা মঙ্গেশকর, আর.ডি.বর্মণ, অমিত কুমার, অলকা ইয়াগ্নিক, অনুরাধা পরোয়াল, বাপ্পি লাহিড়ী, কুমার শানু প্রমুখেরা। এই নামগুলি থেকেই মনে হয় স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে, এসময় বলিউডি অনুবর্তন এবং বলিউডের নাম করা শিল্পীদের দিয়ে গান গাইয়ে জনপ্রিয়তা আকর্ষণের মাধ্যমে বাংলা সিনেমার গান বিপণন-পণ্যে পরিণত হয়েছে। এসব গানের সুরে বা কথায় শিল্পবোধ একেবারেই ছিল না, এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে; তথাপি এ কথা সত্য যে, এমন কিছু নতুনত্ব বা এগিয়ে চলা এসময়কার বাংলা চলচ্চিত্রের গান দেখাতে পারেনি, যাতে আধুনিক গানের দিগন্ত খুলে যায়, বা শ্রোতারা গানের মোহময়তায় আচ্ছন্ন হতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি ১৯৯০ সালে বাংলা সিনেমার একটি গানের কথা, যা গীত হয়েছিল অলকা ইয়াগ্নিকের কণ্ঠে- "ঝাল লেগেছে আমার ঝাল লেগেছে"। এই গান জনপ্রিয়তা পায়নি, এ কথা বলা ঠিক হবে না, কিন্তু এ গানের আবেদন সেই পাড়ার পুজো

প্যান্ডেলের বিনোদন অবধিই সীমায়িত ছিল। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগণের কাছে এই গান পৌঁছালেও তথাকথিত রুচিশীল, মার্জিত জনগণের কাছে এ গান তেমন কোনো আবেদন তৈরি করতে পারেনি। এসময়ে মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবিতে পরিচালকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ থেকেছেন তরুণ মজুমদার, সলিল দত্ত, শক্তি সামন্ত, অনুপ সেনগুপ্ত, বাবলু সমাদ্দার, তপন সিনহা, প্রভাত রায়, স্বপন সাহা, অঞ্জন চৌধুরী, রাম মুখোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী প্রমুখেরা। আবার একালেই একটু অন্য ধাঁচের বক্তব্যধর্মী সিনেমায় এসময় থেকেই পরবর্তী দুই দশক জুড়ে ক্রমশ আসবেন একের পর এক ব্যক্তিত্ব, যেমন- ঋতুপর্ণ ঘোষ, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, অপর্ণা সেন, কৌশিক গাঙ্গুলি, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অনীক দত্ত, শিবপ্রসাদ-নন্দিতা প্রমুখেরা। তারা সম্পূর্ণ অন্য এক ধাঁচের সিনেমা তাদের সমকাল থেকেই তৈরি করতে শুরু করলেন, যে চলচ্চিত্র তৈরি করতে শুরু করল এক নির্দিষ্ট অভিরুচির শ্রোতামণ্ডলী। তারা নাগরিক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এমন এক নির্দিষ্ট রুচির মানুষের জন্য বক্তব্যধর্মী চলচ্চিত্র তৈরি করছেন, যা এক ভিন্নরুচির সংস্কৃতিকেও নির্মাণ করছে ক্রমশ বাংলা চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক সঙ্গীতের বিবর্তনের পথে। এভাবেই ক্রমশ নগর-সংস্কৃতির প্রসারণের মধ্য দিয়ে এই সম্পূর্ণ নতুন ধারার চলচ্চিত্র এক বৃহৎ সংখ্যক দর্শকের ভিত্তিভূমি তৈরি করে ফেলেছিল। এসময়কাল থেকেই ক্রমশ মূলধারার রোমান্টিক ও 'অ্যাকশন'-নির্ভর বাণিজ্যিক ছবি ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষ হারিয়ে তথাকথিত নিম্নমানের ছবি হিসেবে হয়ে পড়ে সমাজের প্রান্তিক মানুষের ক্ষণিক বিনোদনের সামগ্রী। রুচিশীল, শিক্ষিত, সচেতন 'ইন্টেলেকচুয়াল' শ্রেণির বক্তব্যধর্মী চলচ্চিত্র এভাবেই ক্রমশ গ্রাস করে বাণিজ্যিক ছবির সাফল্যকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অভিরুচির দিকে নজর দিয়ে বক্তব্যধর্মী চলচ্চিত্র-নির্ভর গানের ধরনও গেল সম্পূর্ণ পাল্টে। সেই সিনেমায় যেসব গান ব্যবহৃত হত, তার সাথে মূল বাণিজ্যিক ছবির ধারায় ব্যবহৃত গানের ধারা স্পষ্টতই মিলবে না। বাংলা চলচ্চিত্র এভাবেই ক্রমশ তার স্বকীয় চিত্ররূপময় বৈশিষ্ট্যে 'আর্ট'-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে চলেছে আজও। বাংলা চলচ্চিত্রে গানের বাণিজ্যিক সাফল্য তৈরিতে বিশ শতকের নয়ের দশক থেকে আজ পর্যন্ত যে দুই পরিচালক মনে করার মতো কাজ করেছেন, তারা হলেন তপন সিংহ ও তরুণ মজুমদার। তরুণ মজুমদারের 'দাদার কীর্তি', 'ভালোবাসা ভালোবাসা' ইত্যাদি জনপ্রিয় সিনেমার গান একসময় বাঙালির হৃদয়কে উদ্বেল করেছে। কিন্তু বিশ শতকের নয়ের দশকে সুমন-অঞ্জন-নচিকেতা এবং আরো বহু শিল্পীর গানের প্রভাব ও নানা বাংলা ব্যান্ড উঠে আসার ফলে বাংলা গানে অভিমুখ বিচারে রোমান্টিকতার সাথে সমাজবাস্তবতার যে প্রত্যক্ষ সংঘাত চোখে পড়ে, তাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি চলচ্চিত্র-নির্ভর বাংলা গানের ধারাও। ফলে সেই যুগপরিবর্তনের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করার অভিপ্রায়ে স্পষ্টতই দিকপথ পরিবর্তন করে একালের বাংলা ভাষাভাষী চলচ্চিত্রের গান।

নয়ের দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে আধুনিক বাংলা গানের গতিপথে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে নিঃসন্দেহে সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীতের আধুনিক প্রয়োগ। যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল বাঙালির আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন, সুখ-দুঃখ-হতাশা-বেদনায় বাঙালির পরম আশ্রয়, সেই গান নতুন নতুন বিন্যাসে ও ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন নিত্য নব শিল্পসম্মত রূপ পরিগ্রহ করেছে, যার মাধ্যমে এসেছে সিনেমার বাণিজ্যিক সাফল্য। যদিও প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত **১৯৩৫** বা **১৯৩৬** সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মুক্তি' ছবিটিতে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক, তথাপি সে নিরীক্ষা সে অর্থে জনপ্রিয়তা পায়নি। পরবর্তীকালে অভিনব উপায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত যোজনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে তা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারা যায় 'আলো', 'চাঁদের বাড়ি', 'ভালোবাসার অনেক নাম' ইত্যাদি সিনেমায় সুপ্রযুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের আধুনিক প্রয়োগের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। আবার পাশাপাশি আছে 'বং কানেকশন'-এর মতো সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীতের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সুরের সংমিশ্রণ। রবীন্দ্রসংগীতের সাথে এই ধরনের সুরের বিন্যাসকে পূর্বে হয়তো কল্পনাই করা যায়নি। এছাড়াও এখানে বলতেই হয় চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের কথা। তার পরিচালিত সিনেমায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপূর্ব মহিমায় বিরাজিত থেকেছে রবীন্দ্রসংগীত। 'নৌকাডুবি' সিনেমায় 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়', 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে', 'তোমারও অসীমে প্রাণ মন লয়ে', 'আরেকটি প্রেমের গল্প' চলচ্চিত্রে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে', 'শুভ মহরত' সিনেমায় কোনোরকম যন্ত্রানুসঙ্গগত ব্যবস্থাপনা ছাড়াই মনোময় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে'- এসমস্ত গানের চমকপ্রদ প্রয়োগ

চলচ্চিত্র তথা সঙ্গীতশিল্পকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে নিঃসন্দেহে। বাংলা ভাষাভাষী চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ নতুন ঢঙে গল্প বলার এক রীতিকে আত্মীকরণ করেছিলেন তিনি। মানুষের 'আঁতের কথা' দেখানোর এক শিল্পীত রূপকে আয়ত্ত করে বাংলা চলচ্চিত্রকে তিনি বিশ্বমানে নিয়ে যান। পাশাপাশি চলচ্চিত্রে আবহ এবং সঙ্গীত নির্মাণের ক্ষেত্রেও তার নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। চলচ্চিত্রের চলনের সাথে সাযুজ্য রেখে তার অংশ হিসেবেই ঋতুপর্ণ সঙ্গীত যোজনা করেছিলেন মূলত। তাই দৃশ্য পরিবর্তন না ঘটিয়ে যেন তার আপন নিয়মেই তিনি এক অঙ্গাঙ্গী অংশ হিসেবে যুক্ত করেন সংগীতকে। খুব সঙ্গতভাবে মনে পড়তে পারে 'আবহমান' সিনেমায় দু'জন অভিনেত্রীর চলমান সংলাপের মধ্যে দিয়ে অতি সহজ ভঙ্গিতে পটভূমিতে বেজে চলে 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে'। 'ভানুসিংহের পদাবলী'-র মনোমুগ্ধ শ্রোতা ঋতুপর্ণ নিজ মননে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি এই প্রীতিভাবকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন আপন অন্তরের মাঝে। তাই হয়তো ব্রজবুলি ভাষায় স্বচ্ছন্দে লিখে ফেলতে পারতেন 'মথুরানগরপতি কাহে তুম গোকুলে যাও', 'বহু মনোরথে সাজু অভিসারে'-র মতো এমন যুগান্তকারী সৃষ্টি। বক্তব্যধর্মী বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় সংগীত আগে এতটা তাৎপর্যমণ্ডিত রূপে বিকশিত হতে পারেনি। বড়ো জোর হয়তো সেখানে থাকত আবহসংগীতের অনুরণন। কিন্তু সঙ্গীতকেও আপন দক্ষতায় এমন ধারার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও শিল্পীত রূপে এক অপরিহার্য অঙ্গ করে তুলতে পেরেছিলেন ঋতুপর্ণ। 'তিতলি' সিনেমায় শ্রীকান্ত আচার্যের দরাজ কণ্ঠে তিনি সাজিয়ে দিয়েছিলেন বর্ষা আর বিরহের অনুষঙ্গে মানুষের চিরকালীন বিষণ্ণতাবোধের আলেখ্য- 'মেঘপিওনের ব্যাগের ভিতর মনখারাপের দিস্তা'। গান সেখানে আর চলচ্চিত্রে আরোপিত নয় কোনোভাবেই। বরং ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহারে ফুটে ওঠে এক অপূর্ব পরিশীলিত জীবনবোধের ছায়াপাত।

২০০০ সালের পর থেকে আবার বাংলা সিনেমায় গানের গড়নে পরিবর্তন এসেছে। একেবারে সাম্প্রতিক কালের বেশ কিছু বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র ও 'আর্ট ফিল্মে'র উদাহরণ যদি তুলে ধরা যায়, তবে দেখা যাবে যে গানের বদলে যাওয়া রূপ কীভাবে বাঙালির মুখে মুখে জনপ্রিয় হয়েছে। আসলে এ যুগের বাংলা গানকে জনপ্রিয় হতে গেলে এমন আবেদনময় হতে হবে, যাতে শ্রোতা যে কোনো মুহূর্তে সেই গান নিজের মতো করে গুনগুন করে গেয়ে উঠতে পারেন। একদিকে একালের মূল ধারার বাণিজ্যসফল বহু ছবিতে প্রযুক্ত নানা জনপ্রিয় বাংলা গান বাঙালি যুবক-যুবতীদের ক্রমশ আকর্ষণ করেছে নানা চটকদারি ভাষার মোহে। সেসকল গানে শৈল্পিক অভিধা অর্জনের দৈন্য যেমন চোখে পড়ে, তেমনি চোখে পড়ে দর্শককে আকর্ষণের অভিপ্রায়ে গানের সাথে তার দৃশ্যমাধ্যমে চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকার যৌন আবেদন তৈরির কৌশল। আরেকদিকে '১৯শে এপ্রিল', 'অটোগ্রাফ', 'মনের মানুষ', 'আরেকটি তারার খোঁজে', 'মহানগর কলকাতা', 'ইতি মৃণালিনী', 'বাইশে শ্রাবণ', 'চ্যাপলিন', 'ইচ্ছে', 'রঞ্জনা আমি আর আসব না', 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'হেমলক সোসাইটি', 'জাতিশ্বর', 'তিতলি', 'বেলাশেষে', 'প্রাক্তন' ইত্যাদি আরো নানা বহু চলচ্চিত্রের গানগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, বাংলা গানের ভুবন গত দুই দশকে কতটা বদলে গেছে! আশ্চর্য হতে হয় 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এর মতো চলচ্চিত্রের গানগুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে। একদিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'প্যারোডি', আবার তাতেই এসে ক্রমশ মিশে যাবে কাওয়ালি, পাশ্চাত্য সংগীত, পুরোনো দিনের বাংলা গানের সুর, কথা ইত্যাদি। এ মিশেল সত্যই বিস্ময়কর এক নিরীক্ষার মুখোমুখি করেছে বাঙালি দর্শক তথা শ্রোতাকে। তার সাথে সাথে 'সঙ্গীত বাংলা'-র মতো কিছু বাংলা চ্যানেল বা বিশেষ কিছু এফ.এম. স্টেশনে দিন-রাত্রি জনপ্রিয় বিভিন্ন বাংলা গান চলতে থাকার ফলেও ক্রমশ বাংলা গানের সুর-কথার প্রতি ঝোঁক বেড়ে যাওয়ায় বাংলা গান বাঙালির কাছে অনেকটাই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে বলিউডি আগ্রাসনকে খানিক প্রতিহত করেই। এমনকি বাংলা ভাষাভাষী এমন সব চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে, যেগুলিতে সিনেমার বলতে চাওয়া গল্প বা বার্তাটুকু ততটা মুখ্য নয়, যতটা মুখ্য কোনো বিদেশি পর্যটন কেন্দ্রে নায়ক-নায়িকার নৃত্য প্রদর্শন এবং তার সাথে চটুল গান। এইসব গানে রুচিবোধ আর ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ হল শ্রোতার উপভোগ জনিত তৃপ্তিবোধ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রায় এসব গানের 'টার্গেট অডিয়েন্স' হল নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষেরা, যাদের পক্ষে শিল্পবোধের বিচার করা বাতুলতা মাত্র। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এসব বাংলা গানে আজকাল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে হিন্দি, ইংরেজি ইত্যাদি শব্দের মিশেল। বাংলা গানের ভাষা চলচ্চিত্র-নির্ভরতাকে কেন্দ্র করে এমন আমূল বদলে গিয়েছে ক্রমশ যে, বাংলা গানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের নিরিখে সেই বিবর্তন নিঃসন্দেহে এক নতুন পালক সংযোজন করে আধুনিক বাংলা গানের চলার পথে। আর

গীতিকার তথা সুরকার তথা সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে অনুপম রায় আসার পর তো বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গীতের ভাষা আর সুর গেছে আমূল পাল্টে। তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তথাকথিত আর্ট ফিল্মে কথা ও সুরারোপ করে সঙ্গীতের এমন একটি ঘরানা তৈরি করছেন ক্রমশ, যার ব্যতিরেকে বর্তমান বাংলা আর্ট ফিল্মকে প্রায় কল্পনাই করা যায় না। তার বেশিরভাগ গানই কোনো না কোনো জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক। আধুনিক কবিতার মতো চলনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কিছু চিত্রকল্পকে একটানা জুড়ে কার্যত তিনি চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক বাংলা গানের এক নতুন ধারার পথিকৃৎ হয়ে রইলেন। তার গান কোনো গভীর জীবনবোধের কথা ব্যক্ত করে কিনা, সে বিষয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু আধুনিক শ্রোতা তথা দর্শকের যুগোপযোগী চিত্তবিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং খন্ড জীবনচিত্রের উদ্ভাসের মাধ্যমে বাংলা গানকে যুগান্তরের পথে এগিয়ে দিয়েছেন তিনি, একথা অস্বীকার করার উপায় বর্তমানে নেই।

তিন

বাংলা চলচ্চিত্রে ফরমায়েশি পণ্যায়িত গানের উদ্ভব আর গানের শিল্পমূল্য নিয়ে দ্বিধার মাঝেই বাংলা গান নব নব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। মূল ধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র আর 'আর্ট ফিল্ম'- এই দুইয়েরই উদ্দিষ্ট শ্রোতা ছিল আলাদা। ফলত স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ধারার গানগুলি সমাজের যে অংশের কাছে জনপ্রিয় হত, আর্ট ফিল্মের গান তুলনামূলক ভাবে আলাদা এক ধরনের রুচির শ্রোতা তৈরি করে। বাংলা গানের বিপণনযোগ্য পণ্যরূপ তৈরিতে বাংলা সিনেমার ভূমিকাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আসলে স্থান-কাল নির্বিশেষে সিনেমা শিল্পের অন্তর্লীন যে গভীরতর সত্য, তাকে স্পর্শ করে বলেই হয়তো মূর্ত প্রযুক্তি দিয়ে বিমূর্ত জীবনের কাছে আবেদন তৈরি করে সিনেমা। আর এই আবেদন তৈরির এক অন্যতম মূল হাতিয়ার হল সিনেমায় সুপ্রযুক্ত গানের প্রয়োগ। আর সেজন্যই হয়তো সেই সুদূর বিশ শতকের নয়ের দশক থেকে আজ পর্যন্ত ২০২২ সালে দাঁড়িয়েও আবহসঙ্গীতের বাইরেও কণ্ঠসংগীতকে বাদ দিয়ে আমরা বাংলা চলচ্চিত্রের অস্তিত্বকে কল্পনাই করতে পারি না। এই কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এমন অনেক বাংলা সিনেমা তৈরি হয়েছে, যেখানে চলচ্চিত্র খুব একটা জনপ্রিয় না হলেও সেসব সিনেমার গান বহুল বাণিজ্যিক সাফল্য দান করেছে। আর আজকাল তো বাংলা সিনেমার 'বক্স অফিস' সাফল্যের ক্ষেত্রে বাংলা গানের ভূমিকাকে অস্বীকার করার আর কোনো উপায়ান্তর কার্যত নেই। আসলে সবরকম গানকেই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করে অনুসন্ধান করতে হবে, নাহলে হয়তো গত তিরিশ বছরে বাংলা চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগজনিত যে বিবর্তন ঘটে গেছে, তাকে ছুঁয়ে ওঠা সম্ভবপর হবে না। তাই একদিকে গানের নন্দনতাত্ত্বিক বিবর্তন, আরেকদিকে তার বাণিজ্যিক সাফল্য- সমান্তরালভাবে এই দুই মেরুকেই নিয়ে এগোনো ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই দুই মেরুকেই সমান তালে গুরুত্ব দিয়ে চলচ্চিত্রনির্ভর বাংলা গানের পথ 'চরৈবেতি চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারলেই তার সঠিক মান্যায়ন সম্ভবপর হবে। পরিশেষ টানা যাক প্রাবন্ধিক ধ্রুব গুপ্তের একটি যথাযোগ্য মত দিয়ে-

> "উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি দুই নিয়েই চলচ্চিত্রে সংগীত এমন এক ভূমিকা পালন করে আসছে যা অন্যভাবে হত না।... বৌদ্ধিক বা আবেগাশ্রয়ী যে রকম প্রয়োগই হোক- এবং যে ভাবেই তা হোক, সংগীত নানাভাবে চলচ্চিত্রকে ঋণী ও ধনী করে চলবেই। এতে চলচ্চিত্র জগতের লোকদের লজ্জিত হবার কিছু নেই, সিনেমার 'শুদ্ধতা'র দোহাই পেড়ে।"[৪]

তথ্যসূত্র :

১. কমলকুমার মজুমদার, 'চলচ্চিত্রে গানের ভাষা', সত্যজিৎ রায় ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *চলচ্চিত্র*, কলকাতা, ১৯৫০, পৃ. ১০৯

২. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় চলচ্চিত্র*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ. ৬৩

৩. J. Hoberman, 'The Hunger Artist', *Village Voice*, New York, 11th April 1995, P. 51

৪. ধ্রুব গুপ্ত, 'সংগীত ও চলচ্চিত্র', ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), *চলচ্চিত্রের অভিধান*, কলকাতা: বাণীশিল্প, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৫৭৩